চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবী ওলাবিবি এবং পালাগান ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুজিত নস্কর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান পরিচয়ের সাথে সাথে আছে অজস্র দেবদেবীর মন্দির, মসজিদ, মেলা, পালা-পার্বণের বিবরণ। আঞ্চলিক হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে পরবর্তী কালে মুসলমান পির বা বিবিমাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাঙালি জীবন এক ভিন্নতর জীবন সত্যের মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব জেলার একাধিক অঞ্চলে ছিল প্রবল। তবে ধীরে ধীরে এর প্রবাহ মুক্ত হলেও বিভিন্ন মন্দির এবং আঞ্চলিক নামের মধ্যে এর নিদর্শন আজও রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভূতলে যে সমস্ত প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে তা যেমন স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে, তেমনি সেই সময়কার মানুষ বা জনগণের ধর্ম বিশ্বাস, নানা প্রকারের লৌকিক দেবদেবীর প্রাচীনত্ব বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি।[১] চব্বিশ পরগনায় একাধিক লৌকিক দেবদেবীর সন্ধান মেলে, অঞ্চল ভেদে এই সমস্ত দেব দেবীর প্রভাবও যথেষ্ট। এই সমস্ত দেবদেবী শুধু যে হিন্দু সভ্যতার অবদান তা নয়, এরা সৃষ্টি হয়েছে অঞ্চল বিশেষে মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল ওলাবিবি।

ওলাবিবি হলেন নিম্নবঙ্গের একটি বিখ্যাত লৌকিক দেবী। চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে দেবীর পূজা বেশি মাত্রায় দেখা যায়। অঞ্চলের প্রত্যেক পল্লী ও অর্ধ শহরে ওলাবিবির স্থায়ী মণ্ডপ বা থান বর্তমানে দেখা যায়। এই দেবীর প্রসিদ্ধি জনভক্তি ও প্রভাব — প্রতিপত্তি ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণা রায় ও শিশুরক্ষক দেবতা পঞ্চানন্দের পর। ওলাওঠা রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের কল্পনায় এই দেবীর আবির্ভাব।[২] প্রকৃতপক্ষে ওলাবিবি বলা হলেও, দেবীর আসল নাম 'ওলাওঠাবিবি'। ওলাওঠা কথাটি চলতি শব্দ, 'ওলা' ও 'ওঠা' দুটি কথার সমষ্টি। ওলা মানে দাস্ত এবং ওঠা কথার অর্থ বমন হওয়া। অর্থাৎ যে রোগে দাস্ত ও বমন উভয়ই হয় তাকেই 'ওলাওঠা' বলা হয়।[৩]

চব্বিশ পরগনার অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মতো ওলাবিবির পূজা কোনো গৃহেতে বা বাস্তুভূমিতে হয় না বা ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না।

ওলাবিবি পল্লীর বৃক্ষতলে কোনো পর্ণকুটিরে বা থানে ছয়বোনকে নিয়ে থাকেন। সেই জন্য ওলাবিবির থানকে সাতবিবির থানও বলা হয়। এই সাতবোন হিন্দু ও মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন — রক্কিনী, সনকিনী, চমকিনী, বাশুলি, বিলাসিনী, চণ্ডী, জামমালা, কাজিজাম, এছাড়াও মুসলিম প্রধান অঞ্চলে — আসানবিবি, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, মড়িবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেঁটুনেবিবি প্রভৃতি।[৪] তবে সাত ভগ্নীর মধ্যে ওলাবিবিই সর্বাপেক্ষা বেশি সমাদৃত। ওলাবিবির দু-একটি থানে তাঁর সঙ্গে ঝোলাবিবি নামক একটি মাত্র ভগ্নী দেখা যায় এবং ভক্তগণ পূজা ও হাজত দিয়ে থাকেন।

"Ola and Jhola are believed to be two Sisters, the former presides over the disease of Cholera and the letter that of Small-pox"[৫]

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তমাতৃকা বা সাতটি দেবীর একত্র অবস্থায় পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ মহেঞ্জোদাড়োতে একটি মৃন্ময় ফলকে সাতটি নারী মূর্তিকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেছে। সম্ভবত এই মৃন্ময় ফলক থেকে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি শীতলা ও তাঁর ছয় ভগ্নীর, যা পরবর্তীকালে "সাত বাউনী" ও মুসলমান যুগে "সাতবিবি"তে পরিণত হয়েছিল[৬] এবং ওলাবিবিকে এই সপ্তমাতৃকার একজন বলে মনে করা হয়।

ওলাবিবির গায়ের রঙ হরিদ্রা, পরণে শাড়ি, মাথায় শাড়ির ঘোমটা, পায়ে জুতা, কোথাও মাথায় তাজ থাকে। দেবী কোথাও লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তির ন্যায় সুসজ্জিত ও সুশ্রী, কোথাও খানদানি মুসলিম কন্যার পোশাকে সুসজ্জিতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূর্তি দেড় থেকে দুই ফুটের মধ্যে হয়। দেবীর কোনো বাহন নেই। তাঁর উপবিষ্ট মূর্তির কোলে থাকে একটি শিশু, তবে দাঁড়ানো মূর্তিতে শিশু থাকে না। ওলাবিবির পূজায় কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। পুরোহিত যে ধর্মের লোক হোক না কেন সকলে তার হাত দিয়ে পূজা দেয়, প্রসাদ গ্রহণ করে। পূজার নৈবেদ্য হল আতপ চাউল, পান-সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি।[৮]

চব্বিশ পরগনায় ওলাবিবির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হল — ওলাবিবি হল চন্দনেশ্বর রাজার কন্যা বিমলা। চন্দনেশ্বর রাজা ছিলেন মুসলমান বিদ্বেষী এবং সত্যনারায়ণের সেবক। ধর্মের গোঁড়ামী থাকায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন সত্যনারায়ণ ছাড়া তাঁর রাজ্যে অন্য কোনো দেবতার পূজা করা চলবে না। এই কথা ঘোষণার ফলে মুসলমানরা তার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে

থাকেন। তখন সত্যনারায়ণ রাজার এই ভুল ভাঙানোর জন্য নিজেই আপন বিগ্রহের মধ্য থেকে মুসলমান রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন ও নিজেকে সত্যপীর বলে পরিচয় দেন। তখন রাজা সত্যনারায়ণকে সত্যপীর বলে স্বীকার করেন ও আপন কন্যা বিমলাকে সত্যপীরের হাতে অর্পণ করেন। সেই থেকে বিমলা "ওলাবিবি" নামে পরিচিত হন।[৯]

চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ওলাবিবির একাধিক থান, পূজা ও পালাগানের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কাকদ্বীপ, জয়নগর, বারুইপুর, নামখানা, ধোপাগাছি, ঘটকপুকুর, বেগমপুর প্রভৃতি এই সকল অঞ্চলের বহু স্থানে ওলাবিবির থান দেখা যায়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন জায়গায় যেমন — হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি এই সকল স্থানে ওলাবিবির বহু পরিচিত থান লক্ষ্য করা যায়। মধ্য কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটের দুই পার্শ্ববর্তী দুটি মন্দিরে ওলাবিবির মূর্তি আছে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীটের শীতলা মন্দিরে ওলাবিবির মূর্তি অবস্থিত। টালিগঞ্জের বাবুরাম ঘোষ স্ট্রীটের ওলাবিবি, বেলগাছিয়ার ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী, হাওড়ার কাসুন্দিয়া ওলাবিবি, বীরভূম জেলার বোলপুর শ্রীনিকেতন মধ্যস্থ প্রাচীন নীলকুঠির নিকট, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা রাজকোট দূর্গের ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি এই সমস্ত অঞ্চলে বিখ্যাত।[১০]

চব্বিশ পরগনায় ওলাবিবির থান বহু স্থানে থাকলেও, সব থানে দেবীর মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। দেবীর পাকা থানও খুবই কম। সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে দেবীর থান প্রত্যক্ষ করা যায়। কোথাও দেবীর মাটির বা ইঁটের দেওয়ার ও খড় বা টালির ছাউনিযুক্ত থান থাকে। এই ধরনের থানে কোথায় দেবীর মৃন্ময় মূর্তি, কোথায় মাটির বেদী বা ইঁটের বেদীর উপর মাঝারি অর্ধবল উপুড় করা আকৃতির একটি, তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি স্তম্ভক আছে।[১১] ওলাবিবির পূজার বিশেষ কোন মন্ত্র নেই। তবে কোনও কোনও হিন্দু পুরোহিত পূজার সময় "এস মা ওলাবিবি, বেহুলা বাড়ির ঝি" এই কথা ব্যবহার করে থাকেন। এর অর্থ কি তা বোঝা যায় না, এমনকি উক্ত পুরোহিতরাও বলতে পারেন না। কোনও কোনও গ্রামের বৃদ্ধদের বিশ্বাস যে ওলাবিবি নাকি ময়দানবের স্ত্রী, তাঁদের এই ধারণার কারণ কি তা সঠিক ভাবে জানা যায় না।

ওলাবিবির পূজা প্রতি মাসে শুক্লপক্ষে যে কোনও দিন হয়। সম্ভবত মাঘ মাস থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে দেবীর পূজা হয়। পূজা সাধারণত গ্রাম ভিত্তিক হয়ে থাকে। বিশেষ করে কলেরা যখন মহামারীর রূপ নেয় তখন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীগণ চন্দ্রপক্ষে ছাগ ইত্যাদি বলি দিয়ে দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা

করেন। পূজার দিন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মহিলাগণ ব্রত রাখেন, সাতগ্রাম মেঙে আনেন, ও এই সংগৃহীত বস্তু বিক্রয় করে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, মোয়া প্রভৃতি কিনে বড় একটা ধামায় করে দেবীর সামনে হাজতের জন্য বসিয়ে দেন। হাজত শেষে মহিলাগণ প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।[১২]

চব্বিশ পরগনায় ওলাবিবির ব্যাপক পূজার্চনা ও পালাগানের বহুল প্রচলন হওয়ায় একাধিক কারণ আছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হল— এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ। কারণ অতীতে চব্বিশ পরগনার অঞ্চল ছিল জলজঙ্গল অধ্যুষিত, পানীয় জলের অভাব ছিল নিতান্তই, তারা পুকুরের দূষিত জল পান করত এবং জলবাহিত রোগ কলেরা মহামারী রূপ গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে ফেলত। ফলে তারা এই মহামারী রোগের কবল থেকে বাঁচতে ওলাবিবিকে এই রোগের দেবী রূপে পূজা করতে থাকেন।[১৩]

ওলাবিবির পালা চব্বিশ পরগনার একটি নিজস্ব সম্পদ। চব্বিশ পরগনার বাইরের জেলাগুলিতে ওলাবিবির থানা বা মন্দির থাকলেও পালাগায়ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষ। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক পালাগায়কগণই অন্যান্য জেলাতে শিষ্য করে ওলাবিবির গানের প্রচলন করে চলেছেন এবং তাঁদের নিকট থেকে ওলাবিবির তিনটি পালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি হল — বীরসিংহ রাজার পালা, ইচ্ছপবাদশা (পুত্রদান পালা), এবং সুলতানছবির পালা।[১৪] উক্ত পালাগুলি চব্বিশ পরগনার কোন একক পালাগায়ক গেয়ে থাকেন তা নয়, অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের পালাগায়কগণ নিজেদের মনের মতো করে সুন্দরভাবে পালাগানগুলি জনমানসের সামনে তুলে ধরেন।

তবে ওলাবিবির তিনটি পালাগানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বীরসিংহ রাজার কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা পালাগানটি, যা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল —

এলাহি আলামিন আল্লা বন্দিলাম খোদা তালায় যার জাহির দুনিয়ায় গোসায়। বন্দিলাম ফতেমার কদম যার নাম না শুনিলে হয় মন উচাটন কলমদান বাদশার কন্যা মা বিবিমা। ভিখারি বাঙালির বেশে যিনি নিজের জাহির করেছিলেন। সাতদিন অরুণ নগরে ভ্রমণ করে মা আমার বীরসিংহ রাজবাড়ির দ্বারে উপনীত হল, যে রাজা মাকে প্রত্যাখান করল, সেই মা রাজার রাজ্যের ব্যাধিমুক্তি করল। সেই কৃপায় মা এই আসরে এস, তোমায় ডাকি বারে বারে। তব চরণ পাবার আশে আমার এই মনস্কাম। কে বুঝিতে পারে মাগো তব মহিমা অপার। তব গুণ ব্যাখ্যা দিতে হেন সাধ্য আছে

কার। তুমি যে দয়ার অত্যন্ত কে বা বোঝে তোমার অন্ত মায়াতে আছে চূড়ান্ত, তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তুমি যার আছ ঘটে পায় না দুঃখ কোনো মতে। ত্বরাও যে বিপদ সঙ্কটে তোমার অন্ত পাওয়া ভার।

ওলাবিবি ঝোলাবিবি জীর্ণ মলিন বসন পরিধানে এলো চুল এলো দুল তেল নাহি তায় — অবস্থায় প্রভুর নাম ধ্যান মগ্ন হয়ে যেখানে পদার্পণ করেছিলেন সেখানে অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছিল। যেখানে ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে ব্যাধিমুক্তি হয়েছিল। তিনি একদিন বীরসিংহ রাজার রাজ্যে এসে নিজের নাম জাহির করেছিলেন। বীরসিংহ রাজার রাজ্যে বহু মানুষজন, পশু, পাখি ইত্যাদি প্রাণী ব্যাধিযুক্ত হয়ে প্রাণে মারা যাচ্ছে। মা ওলাবিবি ভাবেন মুণ্ডে, আমার জাহির প্রচার করব বীরসিংহ রাজার রাজ্যে ও রাজ্যে মহামারী ব্যাধিমুক্তি করব। এই ভেবে সাতদিন সমস্ত রাজ্য ভ্রমণ করে এক বৃক্ষতলে আসন করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখেন কিছু মহিলা হাতে পূজার ডালা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তারা বীরসিংহ রাজার বাড়ি তেত্রিশ কোটি দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আয়োজিত পূজা দিতে যাচ্ছে। তখন মা ওলাবিবি তাঁদের বলেন ঐ পূজার কিছু অংশ ওলাবিবির নামে হাজত দিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে তোমাদের কোনো অমঙ্গল হবে না বা মহামারী হবে না। কিন্তু তারা সেকথা অমান্য করে গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন।

মা ওলাবিবি ভাবেন মনে এরা অবুঝ, এরা আমার কথার ইঙ্গিত কিছু বুঝল না। কাল আমি স্বয়ং রাজবাড়িতে যাব। রাজার কাছে পাঁচকড়া শিরনি চাইব। রাজা পাঁচকড়া শিরনি দিলে তবে রাজ্য মহামারী ব্যাধিমুক্ত হবে। এই ভেবে মা ওলাবিবি ও ঝোলাবিবি পরদিন রাজার দ্বারে এলেন। রাজা সংবাদ পেলেন যে দুইজন ভিখারিনী দ্বারে উপস্থিত, ও তিনি নফরকে দিয়ে ভিক্ষাদ্রব্য পাঠালেন এবং তাদের ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিতে বললেন। তখন মা ওলাবিবি নফরকে বলেন, তোমার রাজার দ্বারে ভিক্ষা নিতে আসিনি, পাঁচকড়া শিরনির জন্য এসেছি, তোমার রাজাকে এই সংবাদ দাও। আমার আশীর্বাদে তোমাদের রাজ্যের মহামারী দূর হবে ও রাজ্যের মঙ্গল হবে।

" মা তখন বৃক্ষ মাঝে কঠোর দৃষ্টিপাত করিল।
কঠোর দৃষ্টিতে বৃক্ষ জ্বলিতে লাগিল।"

নফর ভিক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং নফর মায়ের মাহাত্ম্য রাজাকে বলতেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা খড়গ আনতে বললেন।

কারণ ভিক্ষা ফিরিয়ে দিয়ে কাঙালিনী রাজাকে অপমান করেছে। অতএব এর শাস্তি প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। রাজা হয়ে ভিখারিনীকে শিরনি দান করা এ আরও অপমান এবং তিনি খড়গ হাতে রাজবাটীর বাইরে এলেন। তখন অন্তর্যামী মা ওলাবিবি রাজার মতলব বুঝতে পেরে রাজার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই রাজার দেহ জ্বালা করতে লাগল এবং রাজা দুয়ার থেকে তাদের দূর হয়ে যেতে বললেন, মা তখন পাঁচকড়া শিরনি দিতে বলেন — যা রাজ্যের মঙ্গল হবে কিন্তু রাজা কিছুতেই বিবিমায়ের কথা শুনলেন না, মা অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেল।

ওলাবিবি একটি তালবৃক্ষ তলে বসেছিলেন; যা মা ওলাবিবি নিজের মহিমাতে সৃষ্টি করেছিলেন। রাজা একথা বিশ্বাস করে না, তিনি বলেন তাঁর পূজায় দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে এই বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন ও তাল ফলিয়েছেন। রাজা বলেন যে এই বৃক্ষের তালশাঁস যে খাবে সে দীর্ঘজীবী হবে। তাই তিনি তাল কাটাতে নফরকে নির্দেশ দেন কিন্তু নফর এ অন্যায় কাজ করতে রাজি হলো না। মা ওলাবিবি এই ঘটনা জানতে পারেন ও তিন ব্যাধি - ওলাওঠা, টানটঙ্কার ও কালাব্যাধি উপস্থিত হন। তাঁরা মায়ের নাম প্রচারের জন্য কি করতে হবে তা জানতে চাইলে মা বলেন রাজার দ্বারে যে তাল বৃক্ষে তাল ফলেছে সেই তালের জলের মধ্যে অবস্থান করতে। ব্যাধিগণ সেই কথামত তালশাঁসের জলে অবস্থান করতে লাগল ও রাজার কথা মতো তালশাঁস প্রথমে রাজপুত্রকে খাওয়ানো হলো এবং রাজপুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রাজসভায় লুটিয়ে পড়ল, এরপর পুত্রকে রানীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রকে নিয়ে রাণী রাজাকে বিবিমায়ের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে বিবিমায়ের নামে শিরনি দিতে বললেন। কিন্তু রাজা রানীমার এ কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। পুত্র মারা গেলেন, রানী কাঁদছে এবং তার বিশ্বাস যে বিবিমা তাঁর পুত্রের প্রাণ হরণ করেছেন, তিনি তিনদিন মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে মাতা বিবিমার নিকট প্রার্থনা করতে থাকলেন। ওলাবিবি ও ঝোলাবিবি কাঙালিনী বেশে রানীমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন ও রানীমার নিকট নিজের পরিচয় দিলেন। তখন রানীমা মায়ের পাদপদ্মে তাঁর মৃতপুত্রকে রেখে মায়ের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। বিবিমা তুষ্ট হয়ে রানীকে নগরে ভিক্ষা মেঙে, শিরনি দিয়ে মায়ের নামে গান হাজত দিতে বললেন, তাহলে তার মৃতপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে। এই কথা শুনে রানী রাজাকে ডেকে বিবিমায়ের ইচ্ছার কথা জানালে রাজা ও রানী উভয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মা পুনরায় রাজপুত্রের জীবনদান করেন এবং ওলাবিবির নাম জাহির হয়।[১৫]

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, চব্বিশ পরগনার লোকসমাজে অদ্যাবধি

কারোর কলেরা রোগ বা ওলাওঠা দেখা দিলে তার পরিবারের লোক প্রথমে ওলাবিবির কথা স্মরণ করেন, তারপর স্থানীয় ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারলেও রোগ ও আরোগ্যের সমস্ত কৃতিত্ব গিয়ে পরে ওলাবিবির উপর। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে এই অঞ্চলের লোকসমাজ ওলাবিবির পূজা, গান, হাজত ও পূজা সংক্রান্ত নানা সংস্কার অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। ওলাবিবি — সংশ্লিষ্ট পূজা - হাজত ও সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে চব্বিশ পরগনায় বিশেষভাবে ওলাবিবির লোকায়ত পালাগান পরিবেশিত হয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.১৫৬

২. Ralph W. Nicholas, Fruits of Worship : Practical Religion in Bengal, Delhi, 2003, Page - 205

৩. আলি আনসার, হুগলি জেলার লৌকিক দেবদেবী, International Journal of Research and Advanced Studies, Volumn-1, 2017, Page 37

৪. চৌধুরী কমল, চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৫১৮

৫. Hora Mr. Sunderlal, The Worship of Deities Ola, Jhola and Bonbibi in Lower Bengal, I.P.A.S.B., XXIX - 1993

৬. চৌধুরী কমল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৫১৮

৭. চক্রবর্তী অমরকৃষ্ণ, বিশ্ব সভ্যতার পাদপ্রদীপে সুন্দরবনের বিবিমা, কলকাতা, অভিমুখ, ২০০৬, পৃ.৭

৮. বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ.১৮৯

৯. নস্কর দেবব্রত, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৩৭৪

১০. বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৮৯-৯০

১১. আলি আনসার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩৬

১২. চৌধুরী কমল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৫১৯

১৩. বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৯১

১৪. নস্কর দেবব্রত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩৭৬

১৫. নস্কর দেবব্রত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩৭৭-৩৮২